بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ জানুয়ারি ২০১৮ মোতাবেক ১২ সুলাহ্ ১৩৯৭ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমার বিশ্বাস হলো, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এমন ছিল যা পৃথিবীর অন্য কোন নবী প্রাপ্ত হন নি। ইসলামের উন্নতির রহস্যও এটিই যে, মহানবী (সা.)-এর আকর্ষণশক্তি অসাধারণ ছিল। আর তাঁর কথায় এমন প্রভাব ছিল যে, যে-ই শুনতো সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ত। মহানবী (সা.) যাদেরকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করেছেন তাদেরকে পরিষ্কার-পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন।"

তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের জীবনে কেমন পরিবর্তন সাধন করেছেন-এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"সাহাবীদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাতে তাদের মাঝে কোন মিথ্যাবাদী দেখতে পাওয়া যায় না, অথচ আরবের প্রারম্ভিক অবস্থার প্রতি যখন আমরা দেখি, তারা অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পতিত পরিদৃষ্ট হয়। তারা ছিল মূর্তিপূজায় নিমগ্ন, এতীমদের সম্পদ ভক্ষণকারী এবং সকল প্রকার অপকর্মে ধৃষ্ট ও দুঃসাহসী। তাদের **জীবন-জীবিকা ছিল ডাকাতদের ন্যায়। এক কথায় তারা আপাদমস্তক যেন নোংরামিতেই লিপ্ত ছিল।** [কিন্তু তিনি (সা.) তাদের জীবনে এমন বিপ্লব আনয়ন করেন যার দৃষ্টান্ত অন্য কোন জাতিতে দেখা যায় না। আর মহানবী (সা.)-এর এই নিদর্শন এত মহান যে, এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন,] **এটিই পৃথিবীর দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কোন এক ব্যক্তির সংশোধনও অনেক দুরূহ কাজ হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কোন এক ব্যক্তির সংশোধন করাও অনেক কঠিন এক বিষয়) কিন্তু এখানে পুরো এক জাতি প্রস্তুত করা হয়েছে যারা ঈমান এবং নিষ্ঠার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, যেই সত্য তারা গ্রহণ করেছিল তার খাতিরে গবাদি পশুর মতো জবাই হয়েছেন। সত্যিকার অর্থে তারা পার্থিব জগতের মানুষ ছিলেন না বরং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা, পথনির্দেশনা এবং প্রভাববিস্তারী নসীহত তাদেরকে আধ্যাত্মিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছিল। তাদের মাঝে পবিত্র গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছিল। ...ইসলামের এই দৃষ্টান্তই আমরা আজ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করি। তিনি (আ.) বলেন, এই সংশোধন এবং হেদায়েতের কারণেই আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ মহানবী (সা.)-এর নাম মুহাম্মদ রেখেছেন, যার ফলে পৃথিবীতে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, কেননা পৃথিবীকে তিনি শান্তি, মিমাংসাপ্রিয়তা,**

উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং সৎকর্মশীলতায় ভরে দিয়েছেন।" **(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৬, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

আজও আমরা দেখি, ন্যায়পরায়ণরা এ কথা স্বীকার না করে পারে না যে, চরম অজ্ঞ, অসভ্য-অভদ্র-একগুঁয়ে ও নোংরামিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত লোকদেরকে মহানবী (সা.) শিক্ষিত এবং খোদাপ্রেমিক মানুষে পরিণত করেছেন।

কয়েক বছর পূর্বে সাক্ষাতের জন্য আগত একজন ইহুদী আলেম আমাকে বলেন, ইহুদীদের মসজিদে আকসায় প্রবেশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও আমি সেখানে গিয়েছি এবং সবকিছু দেখে এসেছি। মসজিদ পরিদর্শন সংক্রান্ত যে বিস্তারিত ঘটনা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন, তা বেশ দীর্ঘ। যাহোক তিনি বলেন, আমি মুসলমান নই মর্মে মসজিদ দেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত গাইড বা তত্ত্বাবধায়কের বেশ কয়েকবার সন্দেহ হয়। তিনি বলেন, প্রত্যেক সুযোগে আমি এমন কোন কথা বলতাম যার উদ্দেশ্য হতো এটি প্রকাশ করা যে, আমি একজন মুসলমান। এমনকি সেই তত্ত্বাবধায়ককে আশ্বস্ত করার জন আমি مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه। اللَّهُ إِلَهَ إِلَّا لَا কলেমাও পাঠ করি। যাহোক পুরো মসজিদ ভালোভাবে দেখার পর মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক বা গাইড আমাকে বলে, যদিও আপনি কলেমা পাঠ করেছেন কিন্তু আপনার মুসলমান হওয়া সম্পর্কে আমার এখনো সন্দেহ আছে, আমি পুরোপুরি আশ্বস্ত নই। মসজিদ দেখা তো শেষ করেছেন, এখন বলুন, আসল ঘটনা কী? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, তুমি ঠিকই বলছ, আমি মুসলমান নই, ইহুদী। কলেমা পাঠ করার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, আমি لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। -তে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه। যে বললাম, তা-ও আমি বিশ্বাস করি, কেননা তখন আরবদের অবস্থা কী ছিল সে ইতিহাস সম্পর্কে আমি সবিশেষ অবহিত। মহানবী (সা.)-এর দাবির পূর্বে আরবদের যে অবস্থা ছিল, একজন নবীই কেবল সেই অবস্থার সংশোধন করতে পারেন। জগতপূজারী কোন নেতা সেই অবস্থা পরিবর্তন করতে পারতো না। তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনি বা না আনি, আমি তাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী মনে করি। যাহোক বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর এই মহান বিপ্লব সাধনের কথা সে-ও স্বীকার করেছে।

অতএব, আজও যদি কেউ ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে, সাহাবীদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা দেখে সে একথা স্বীকার না করে পারবেই না যে, সত্যিই তিনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল ছিলেন। সাহাবীদের সম্পর্কে এবং তাদের অসাধারণ মর্যাদা সম্পর্কে আর তাদের জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার বলেন:

"সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেখ! সত্যিকার অর্থে সাহাবায়ে কেরামের (অর্থাৎ সম্মানিত সাহাবীগণের) আদর্শ এমন, যেন তারা নবীকূলের প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ্ তা'লা কেবল কর্ম পছন্দ করেন। তারা গবাদি পশুর মতো নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। আর তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যেভাবে নবুয়্যতের একটি রূপ আদম (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে,

(অর্থাৎ নবুয়্যতের চেহারা-সূরত-আকৃতি ও মর্যাদার যেরূপ ধারণা পাওয়া যায় তা আদমের যুগ থেকেই চলে আসছে।) **কিন্তু তা বোধগম্য ছিল না। আর সাহাবীরা তা কর্মে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন, আর বুঝিয়ে গেছেন যে, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা একে বলে।** তিনি (আ.) আরো বলেন, **এরপর যে আরাম বিমুখ জীবন তারা অতিবাহিত করেছেন এর দৃষ্টান্তও কোথাও পাওয়া যায় না। সম্মানিত সাহাবীদের দল সেই বিস্ময়কর গোষ্ঠী এবং সম্মানিত ও অনুকরণীয় জামা'ত, যাদের হৃদয় ছিল বিশ্বাসে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। বিশ্বাস সৃষ্টি হলে হৃদয়ে প্রথমত ধীরে ধীরে সম্পদ ইত্যাদি ব্যয়ের প্রেরণা জাগে। আর বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয় তখন বিশ্বাসী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।"** (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

এরপর সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (সূরা আন্ নূরঃ ৩৮) (অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে খোদা তা'লার স্মরণে উদাসীন করতে পারে না।) আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন, **"সাহাবীদের অনুকূলে এই একটি আয়াতই যথেষ্ট যে, তারা সুমহান সব পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। আর ইংরেজরাও এ কথা স্বীকার করে যে, কোথাও তাদের দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মরুবাসী হওয়া সত্ত্বেও এত বীরত্ব এবং সাহসিকতা সত্যিই বিস্ময়কর!"** (মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৪, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি (আ.) বলেন, **"তারা এমন সুপুরুষ যে, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা তা'লার স্মরণ থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না আর কোন ক্রয়-বিক্রয় এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় তারা এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন যে, জাগতিক ব্যস্ততা যত বেশিই হোক না কেন তাদের ইবাদতের পথে তা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।"** (বারাহীনে আহমদীয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৭-টীকা)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লার কামেল বা পুণ্যবান বান্দা তারাই হয়ে থাকে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,** لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ। **অর্থাৎ হৃদয় যখন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক এবং প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাঁর থেকে তা পৃথক হতেই পারে না। এর একটি অবস্থা এভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, কারো সন্তান অসুস্থ হলে সে যেখানেই যাক আর যে কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন, তার অন্তরাত্মা ও মনোযোগ সেই সন্তানেই নিবদ্ধ থাকবে। অনুরূপভাবে যারা খোদার সাথে নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক এবং ভালোবাসার বন্ধন রচনা করে তারা কোন অবস্থাতেই খোদা তা'লাকে ভুলে যায় না।"** (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০-২১, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব সাহাবীগণ রিজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম খোদার সাথে সেই সত্যিকার সম্পর্ক এবং প্রেমবন্ধন রচনা করেছিলেন যে, তারা খোদা তা'লা সম্পর্কে উদাসীন হবেন বা তাঁর খাতিরে কোন ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধা করবেন এমন প্রশ্নই উঠে না। এ ক্ষেত্রে সাহাবীদের অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হযরত খাব্বাব বিন আল-আর্‌ত (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তার মাঝে এতটাই খোদাভীতি ছিল যে, তিনি দেখার জন্য নিজের কাফনের কাপড় চেয়ে পাঠান এবং দেখতে পান যে, এটি অতি উন্নত মানের একটি কাফনের কাপড়। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনকে বলেন, তোমরা এত উন্নত মানের কাফন আমাকে পরাবে! এবং কান্না আরম্ভ করেন আর বলেন, মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত হামযা (রা.) কাফন হিসেবে একটি মাত্র চাদর পেয়েছিলেন। আর তা-ও এত ছোট যে, পা ঢাকলে মাথা খালি হয়ে যেত আর মাথা ঢাকা হলে পা বেরিয়ে যেত। তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে ঘাস দ্বারা পা ঢেকে দেয়া হয়। এরপর পরম খোদাভীতির সাথে বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আমি এক দিনার বা দিরহামেরও মালিক ছিলাম না। কিন্তু আজ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কল্যাণে, ঐশী নিয়ামতের কল্যাণে এবং সেসব কুরবানী গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন যে, আমার গৃহকোণে যে সিন্দুক পড়ে আছে তাতেই চল্লিশ হাজার দিরহাম রাখা আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এত অঢেল দিয়েছেন যে, আমার ভয় হয়, কোথাও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কর্মের প্রতিদান পুরোটা এ পৃথিবীতেই দিয়ে দেন নি তো! আর কোথাও পারলৌকিক জীবনের প্রতিদান থেকে আমি বঞ্চিত হব না তো! তাঁর অন্তিম ব্যাধিতে সাহাবীরা যখন তাকে দেখতে যান এবং তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বলেন, আপনিও মনে হয় জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং বলেন, এ কথা মনে করো না যে, আমি মৃত্যু ভয়ে কাঁদছি। বরং আমি এজন্য কেঁদেছি যে, তোমরা আমাকে যেসব সাহাবীর ভাই আখ্যায়িত করেছ, তাদের মর্যাদা অতীব মহান ছিল। আমি জানি না, তাদের ভাই হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কি না। তিনি (রা.) আরো বলেন, যারা আমাদের পূর্বে অতীত হয়েছেন তারা জাগতিক এই ধন-সম্পদ যা আমরা উপভোগ করছি, তা উপভোগ করেন নি। খোদাভীতি এবং তাকওয়ার মান এমন ছিল যে, নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল জ্ঞান করতেন। খোদাভীতির কারণে তার এই আশঙ্কা ছিল যে, মৃত্যুর পর খোদা আদৌ সন্তুষ্ট হবেন কি না। আর এ দোয়াই করতেন, যেন খোদা সন্তুষ্ট হন। **[আত্‌তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮-৮৯, খাব্বাব বিন আলআর্‌ত (রা.), ১৯৯৬ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিল্লুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

তাঁর কুরবানী এবং ধর্মসেবা কারো চেয়ে কম ছিল না। হযরত আলী (রা.) যখন খলীফা ছিলেন তখন তিনি তার জানাযা পড়ান এবং তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু কথা বলেন। সেসব শব্দের মাধ্যমেই হযরত খাব্বাব এর প্রকৃত মর্যাদার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা খাব্বাবের প্রতি কৃপা করুন। তিনি সুগভীর ভালোবাসা এবং আকর্ষণ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এরপর হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতঃপর যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন তা এক মুজাহিদ বা সংগ্রামী মানুষের জীবন ছিল। তিনি ভয়াবহ পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন আর পরম ধৈর্য এবং অবিচলতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। হযরত আলী (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকের প্রতিদান নষ্ট করেন না যারা সৎকর্মশীল। **[আসাদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭৭, খাব্বাব বিন আলআর্‌ত (রা.), ২০০৩ সনে দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতে হযরত খাব্বাবের পদমর্যাদা কত মহান ছিল দেখুন! একবার হযরত ওমর (রা.) হযরত খাব্বাবকে ডেকে তার মসনদ বা আসনে বসান এবং বলেন, হে খাব্বাব! আপনি আমার সাথে এই মসনদে বসার যোগ্যতা রাখেন। বেলাল ছাড়া আর কেউ আমার সাথে এই মসনদে বসার যোগ্য বলে আমি মনে করি না। তিনি অর্থাৎ হযরত বেলালও প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। হযরত খাব্বাব বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত বেলালও এর যোগ্য, কিন্তু সত্য কথা হলো, মুশরিকদের হাত থেকে হযরত বেলালকে রক্ষা করার মানুষ ছিল। তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। কিন্তু আমাকে এই যুলুম এবং অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না। আর এমনও একদিন আসে যখন কাফিররা আমাকে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করে এবং এক নিষ্ঠুর-নির্দয় ব্যক্তি আমার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে যার ফলে সেই আগুন থেকে বের হওয়া আমার জন্য সম্ভব ছিল না। কয়লায় পড়ে থাকার কারণে আমার পিঠ ঝলসে যায়। কয়লা জ্বালিয়ে তাকে তার ওপর শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপর হযরত খাব্বাব তার পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখান, যেখানে সাদা লাইনের দাগ কাটা চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, জ্বলন্ত কয়লায় শুয়ে থাকার কারণে এই দাগ পড়েছে। চর্বি গলে গিয়েছিল– চামড়া ঝলসে গিয়েছিল আর তারপর এই সাদা চামড়া বের হয়ে আসে। হযরত খাব্বাব (রা.) বদর, খন্দক (পরিখা) এবং উহুদের যুদ্ধেও যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এ সবকিছু সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তাঁর এ চিন্তাই ছিল যে, জানি না খোদা তা'লা সন্তুষ্টি হবেন কি না! **[আত্তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৮ খাব্বাব বিন আলআর্‌ত (রা.), ১৯৯৬ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিলুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

আরেকজন সাহাবী ছিলেন, হযরত মাআয বিন জাবাল। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে ইবাদত করতেন। নিকটাত্মীয়রা তাঁর তাহাজ্জুদ নামাযের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার দরবারে নিবেদন করতেন, হে আমার প্রভু! এখন সবাই ঘুমন্ত, আর চোখ নিদ্রিত। হে আল্লাহ্! তুমি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। আমি তোমার কাছে জান্নাত-প্রত্যাশী, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার কিছু আলস্য রয়েছে, অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে আমি কিছুটা অলস, আর অগ্নি থেকে দূরে সরে আসার ক্ষেত্রে দুর্বল এবং শক্তিহীন। আমি জানি, জাহান্নামের অগ্নিও রয়েছে, আর এর (থেকে নিরাপদ থাকার) জন্য সৎকর্ম করতে হয়। কিন্তু এটি থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় আমি খুবই দুর্বল। হে আল্লাহ্! নিজ সন্নিধান থেকে তুমি আমাকে পথনির্দেশনা দাও, এমন পথনির্দেশনা দাও যা কিয়ামত দিবসেও আমি লাভ করব, যেদিন তোমার প্রতিশ্রুতির কোন ব্যত্যয় হবে না। খোদা তা'লার পথে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন আর এ কারণে তিনি ঋণগ্রস্তও হয়ে যেতেন। **[আসাদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪০২, মাআয বিন জাবাল (রা.), ২০০৩ সনে দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

হযরত কা'ব বিন মালেকের পুত্র হযরত মাআয (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হযরত মাআয (রা.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার ছিল খুবই অভিনব। তিনি খুবই

সুদর্শন এবং দানশীল ছিলেন। তার দোয়াও অনেক বেশি গৃহীত হতো। আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইতেন, খোদা তা'লা তাকে তা-ই দান করতেন। তার সাথে খোদার বিশেষ ব্যবহার ছিল। ঋণে জর্জরিত হলে তা থেকে মুক্তির ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লাই করতেন। খোদা তা'লা তাকে এক বিস্ময়কর জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন। **(আলমু'জিমুল কবীর লিত্তিবরানী, ২০শ খণ্ড, পৃঃ ৩০-৩২, হাদীসঃ ৪৪, ২০০২ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিলুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

খোদাপ্রেমের কারণে মহানবী (সা.)-এর প্রতিও এই সাহাবীদের ভালোবাসা ছিল বা রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার কারণেই খোদা তা'লার সাথেও তাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল কেননা, তাঁর (সা.) আধ্যাত্মিক শক্তিই তাদের হৃদয়ে খোদার ভালোবাসার চেতনা সৃষ্টি করেছিল। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের মাঝে এক বিপ্লব সাধন করেছিল, নতুবা প্রেম এবং ভালোবাসার এই উপাখ্যান কখনো রচিত হতো না। খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের যে ভালোবাসা ছিল তা-ও এমন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও উল্লেখ করেছেন।

যেমন হযরত শাম্মাস বিন উসমান (রা.) সম্পর্কে ইতিহাস এমন ঘটনা সংরক্ষিত করেছে যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তার ভালোবাসার এক দৃষ্টান্ত হয়ে গেছে বা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। ইসলামের খাতিরে কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকারেরও এক সুমহান দৃষ্টান্ত এটি। উহুদের যুদ্ধে যেখানে হযরত তালহার প্রেম ও ভালোবাসার কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কীভাবে তিনি নিজের হাত মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার সামনে ধরে রেখেছেন যেন কোন তির তাঁকে (সা.) আঘাত না করে, সেখানে হযরত শাম্মাসও সুমহান ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত শাম্মাস মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং প্রতিটি আঘাত নিজের ওপর বরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত শাম্মাস সম্পর্কে বলেন, শাম্মাসকে আমি যদি কোন কিছুর সাথে তুলনা করি তাহলে ঢাল বা বর্মের সাথে তুলনা করব, কেননা উহুদের ময়দানে সে আমার জন্য এক ঢাল বা বর্মই হয়ে গিয়েছিল। সে আমার নিরাপত্তা প্রদান করতে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমার অগ্রে, পশ্চাতে, ডানে এবং বামে লড়াই চালিয়ে গেছে। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যেদিকে তাকাতাম সেদিকেই শাম্মাসকে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে দেখতাম। এরপর শত্রু যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম হয় এবং তিনি (সা.) চেতনা হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান, তখনও শাম্মাসই ঢাল বা বর্ম হিসেবে সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং গুরুতর আহত হন। সে অবস্থায়ই তাকে মদিনায় নিয়ে আসা হয়। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, সে আমার চাচাত ভাই। আমি তার কাছের মানুষ এবং আত্মীয়া। তাই আমার ঘরেই তার চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কিন্তু গুরুতর আহত হওয়ার কারণে দেড়-দু'দিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, শাম্মাসকেও তাঁর পরিহিত পোশাকেই সমাহিত করা হোক যেভাবে অন্যান্য শহীদকে করা হয়েছে। **[আত্তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১ শাম্মাস বিন উসমান (রা.), পৃঃ ১১৫ তালহা বিন উবায়েদ (রা.), ১৯৯৬ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিলুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)। তিনি হযরত ওমরের ভগ্নিপতি ছিলেন। আর তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে ইসলাম গ্রহণের দোষে মারার জন্য হযরত ওমর (রা.) যখন হাত তোলেন তখন তার স্ত্রী অর্থাৎ হযরত ওমরের বোন বাধ সাধেন এবং আহত হন। হযরত ওমরের ওপর এর এমন প্রভাব পড়ে যে, ইসলাম গ্রহণের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। **[সীরাত ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৫১-২৫২, ইসলাম ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), ২০০১ সনে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

হযরত সাঈদ (রা.)-এর আত্মাভিমান এবং খোদাভীতি সংক্রান্ত একটি ঘটনা পাওয়া যায়। তার জীবিকা নির্বাহ হতো একটি জায়গীরের (সম্পত্তির) মাধ্যমে। অর্থাৎ তার কিছু জমি ছিল আর এই জমির আয়েই দিনাতিপাত হতো। তার জমি সংলগ্ন আরেক মহিলারও এক খণ্ড জমি ছিল। সেই মহিলা তার জমির ওপর মালিকানা দাবি করে বসে যে, আপনি আমার জমির একাংশ জবরদখল করে রেখেছেন। তখন হযরত সাঈদ (রা.) বলেন, কোন মামলা-মোকদ্দমার প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি পুরো জমি থেকে হাত গুটিয়ে নেন আর জমি সে মহিলাকে হস্তান্তর করেন এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো জমির এক বিঘতও হস্তগত করে, কিয়ামত দিবসে তাকে সাতটি জমির বোঝা বহন করতে হবে। অতএব আমি এই অভিযোগে অভিযুক্ত হতে চাই না, আর ঝগড়া-বিবাদেও লিপ্ত হতে চাই না। কিন্তু কেউ যেন এ কথা না বলে যে, তিনি কারো জমি জবরদখল করেছেন, অর্থাৎ কেউ এ কথাও বলতে পারত যে, তিনি একজন মহিলার জমি জবরদখল করে রেখেছিলেন, আর এখন এটি জানাজানি হওয়ায় তা ফেরত দিচ্ছেন। তাই সম্ভাব্য এই অভিযোগ বা অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য, তিনি যেহেতু অনেক বেশি দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন, সেই মহিলার জন্য এই দোয়া করেন যে, এই মহিলা যদি নির্যাতিতা না হয় বরং অত্যাচারী হয়, তাহলে খোদা যেন তাকে ধৃত করেন এবং তার পরিণাম যেন অশুভ হয়। অতএব বর্ণনাকারীদের বর্ণনানুসারে সেই মহিলা অন্ধ হয়ে মারা যায় এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়। **(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ফারায়েয, হাদীসঃ ৪১৩৪)**

সত্য কথা বলা এবং এ ক্ষেত্রে কাউকে ভয় না করা সাহাবীদের নিত্যনৈমিত্তিক চরিত্র ছিল। হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, কুফায় আমীর মুয়া'বিয়ার নিযুক্ত গভর্ণর একদিন সেখানকার জামে মসজিদে উপবিষ্ট ছিল। হযরত সাঈদ (রা.)ও সেখানে আসেন। গভর্ণর গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে তাকে স্বাগত জানান এবং নিজের সাথে বসান। ইতোমধ্যে কুফার এক ব্যক্তি সেখানে আসে এবং হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে অপলাপ আরম্ভ করে। হযরত সাঈদ (রা.) এতে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি এরূপ করেন নি যে, ঠিক আছে, গভর্ণরের সামনে বলছ বলে আমি চুপ থাকব আর এটিই প্রজ্ঞার দাবি। বরং তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি, আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের বিন আওয়াম, সা'দ এবং আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতে বসবাস করবে। তিনি আরো বলেন, এছাড়া এক দশম ব্যক্তিও রয়েছে, যার নাম আমি নিচ্ছি না।

জোর দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সেই দশম ব্যক্তি হলাম আমি, অর্থাৎ সাঈদ বিন যায়েদ। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল সুন্নাহ্, হাদীসঃ ৪৬৪৯-৪৬৫০)**

তার পক্ষ থেকে একটি হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় সুদ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয় হলো, মুসলমানের সম্মানের ওপর অন্যায় আক্রমণ। **(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, হাদীসঃ ৪৮৭৬)**

অথচ আজ এ বিষয়টিই মুসলমানরা ভুলে গেছে। আর বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্র পরিসর অর্থাৎ ছোটোখাটো বিষয় পর্যন্ত আমরা দেখি যে, এক মুসলমান ব্যক্তিস্বার্থের কারণে অন্য মুসলমানের সম্মানে আঘাত হানে।

আরেকজন সাহাবী হযরত সুহায়ব বিন সিনান রূমী (রা.)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মুসলমানরা যখন হিজরতের অনুমতি লাভ করে তখন হযরত সুহায়বও হিজরতের সংকল্প করেন। প্রথমে এসেছিলেন এক ক্রীতদাস হিসেবে এরপর মুক্তি পান। উন্নতি করেন আর ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি করতে করতে অনেক সম্পদশালী ব্যবসায়ী হয়ে ওঠেন আর ব্যবসা করে অঢেল ধনসম্পদ উপার্জন করেন। হিজরত করে চলে যাওয়ার সময় মক্কাবাসীরা বলে, তুমি একজন কপর্দকহীন দাস হিসেবে আমাদের শহরে এসেছিলে। আমরা তোমাকে এখান থেকে উপার্জিত ধনসম্পদ আদৌ নিয়ে যেতে দিব না। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি আমার সম্পদ আমি ছেড়ে দিচ্ছি। সম্পদ না নিলে যেতে দিবে তো? যাহোক তিনি তার অর্ধেক সম্পদ মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দেন এবং হিজরতের পরিকল্পনা করেন। নিজ পরিবারসহ তিনি যখন মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন কতক কুরাইশ তার পিছু ধাওয়া করে। সুহায়ব (রা.) অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন, ভালো তির চালনা জানতেন এবং দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। কাফিরদের দেখে তূণ থেকে সব তির বের করে তিনি ভূমিতে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, হে কুরাইশ! তোমরা জান যে, আমি তোমাদের চেয়ে দক্ষ তিরন্দাজ। আমার তির না ফুরোনো পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। এরপর রয়েছে আমার তরবারি। আমার বিরুদ্ধে এর সাথেও তোমাদের লড়াই করতে হবে। অতএব অশান্তি না করে আমাকে যেতে দাও- এটিই ভালো হবে। আর এর বিনিময়ে আমার অবশিষ্ট সম্পদ, যা আমি অমুক জায়গায় রেখেছি তা নিয়ে নাও। এভাবে গভীর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পদ বিসর্জন দিয়ে তিনি তার সন্তানদেরও রক্ষা করেন এবং নিজেও নিরাপদে পৌঁছে যান। সুহায়ব যখন মহানবী (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হন আর পুরো সম্পদ বিসর্জন দিয়ে কীভাবে প্রাণ ও ঈমান রক্ষা করে এখানে এসেছেন তা বর্ণনা করেন, তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি লোকসানজনক কোন ব্যবসা কর নি, অনেক ভালো ব্যবসা করেছ। **[আত্তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২১ সুহায়ব বিন সিনান (রা.), ১৯৯৬ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিলুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

প্রত্যেক সাহাবীরই নিজস্ব রীতি ছিল। একবার হযরত ওমর (রা.) হযরত সুহায়ব (রা.)-কে বলেন, তুমি মানুষকে অনেক বেশি আপ্যায়ন কর। আমার আশঙ্কা হয়, এতে কোথাও আবার অপব্যয় না হয়ে যায়। হযরত সুহায়ব (রা.) বলেন, আমি মানুষকে এই যে

আতিথ্য করি, তা-ও মহানবী (সা.)-এর এক নির্দেশ অনুযায়ী করি। তিনি (সা.) আমাকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ তারা, যারা মানুষকে খাবার খাওয়ায় এবং সালামের প্রচলন করে। মানুষকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলা- এটিও একটি পুণ্য। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) একে সর্বোত্তম লোকদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে এই যে নসীহত আমি শুনেছিলাম, তা মদিনায় আসার পর তিনি আমাকে করেছিলেন। আমি সেটিকে আমার হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি। আর বৈধ ক্ষেত্র ছাড়া আমি অর্থব্যায় করি না, অপব্যয় করি না। **[মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৯২৪, হাদীসঃ ২৪৪২২, মুসনাদ সুহায়ব বিন সিনান (রা.), ১৯৯৮ সনে আলামুল কুতুবুল ইলমিয়া বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

হযরত ওমর (রা.)-এর দৃষ্টিতেও হযরত সুহায়ব (রা.)-এর মর্যাদা অনেক বড় ছিল। অতএব হযরত ওমর (রা.) তার জানাযা হযরত সুহায়ব (রা.)-কে দিয়ে পড়ানোর ওসীয়্যত করে গিয়েছিলেন। আর পরবর্তী খলীফা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নামাযের ইমামতিও তিনিই করেন। **[আসাদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৩, আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.), ২০০৩ সনে দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

হযরত উসামা (রা.) মহানবী (সা.) এর মুক্ত দাস হযরত যায়েদের পুত্র ছিলেন। হযরত উসামা (রা.) সেই সৌভাগ্যবান মানুষ ছিলেন যাকে মহানবী (সা.) তাঁর স্নেহ এবং ভালোবাসার সনদে ধন্য করেছেন। **[আসাদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১, উসামা বিন যায়েদ (রা.), ২০০৩ সনে দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ]**

মহানবী (সা.) তাকে এতটা ভালোবাসতেন যে, উসামা নিজেই বলেন, মহানবী (সা.) হযরত হোসেইন এবং তাকে অর্থাৎ তাদের উভয়কে দুই উরুতে বসাতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ্! এই দু'জনকেই তুমি ভালোবেসো কেননা আমিও তাদেরকে ভালোবাসি। **(আলমু'জিমুল কবীর লিত্তিবরানী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭, হাদীসঃ ২৬৪২, ২০০২ সনে দারু আহইয়াইত্ তুরাছিলুল আরবী বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

কিন্তু যেখানে তরবীয়ত এবং ধর্মের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে কেবল খোদার নির্দেশাবলীই অগ্রগণ্য, সেখানে ব্যক্তিগত ভালোবাসার কোন স্থান নেই। মহানবী (সা.)-এর যুগে হযরত উসামা অল্পবয়স্ক ছিলেন, বরং [মহানবী (সা.) এর] মৃত্যুর সময়ও তার বয়স ছিল আঠারো বছর। তবে কোন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ তিনি পেয়েছেন। একটি ঘটনায় এসেছে, এক কাফির এক যুদ্ধে হযরত উসামার মুখোমুখি হলে তাৎক্ষণিকভাবে কলেমা পাঠ করে। কিন্তু তবুও তিনি (রা.) এ কথা ভেবে তাকে হত্যা করেন যে, মৃত্যুভয়ে সে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করছে। হযরত উসামা (রা.) বলেন, আমি এই ঘটনা মহানবী (সা.) এর সকাশে বিবৃত করলে তিনি (সা.) বলেন, কলেমা পাঠ করা সত্ত্বেও তুমি সেই ব্যক্তিকে হত্যা করলে? আমি নিবেদন করলাম, সে শুধু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কলেমা পাঠ করেছিল। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে? এরপর তিনি (সা.) আরো বলেন, তুমি কি তাকে কলেমা শাহাদাত পাঠ করা সত্ত্বেও হত্যা করলে? হযরত উসামা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এই বাক্য এতবার পুনরাবৃত্ত করেন যে, আমি ভাবলাম, হায়! আজকের পূর্বে

আমি যদি মুসলমান না হতাম (তবেই ভালো হতো)। উসামা (রা.) বলেন, আমি তখনই অঙ্গীকার করি, ভবিষ্যতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী কোন ব্যক্তিকে আমি কখনো হত্যা করবো না। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীসঃ ৪২৬৯) (আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২, উসামা বিন যায়েদ (রা.), ২০০৩ সনে দারুল ফিকর বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)**

হায়! আজকের মুসলমানরাও যদি এ কথাগুলো বুঝত! ইসলামের নামে অমুসলমানদের ওপর যে নির্যাতন করা হচ্ছে তাতো করছেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো পরস্পর মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করছে। সিরিয়ার যুদ্ধকেই নিন, এ সম্পর্কে বলা হয়, এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে গত কয়েক বছরে সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করেছে। যারা কলেমা পাঠকারী তারাই পরস্পরকে হত্যা করছে বা কলেমার নামে হত্যা করছে। ইয়েমেনে কলেমা পাঠকারীদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যুলুম ও অত্যাচারও হচ্ছে এবং টর্চার বা নির্যাতনও করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সেই মুসলমানদেরও কাণ্ডজ্ঞান এবং বিবেকবুদ্ধি দিন। সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা এবং রসূলপ্রেমের দাবি যেন কেবল বাকসর্বস্ব না হয়, বরং সে অনুসারে তারা যেন আমলও করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এরা ইসলামের নামে নিজেদের আমিত্ব এবং অহমিকারই পূজা করছে। ইসলামী শিক্ষার 'ক-খ'ও এরা জানে না। এরা কেবল নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করে। মুখে আল্লাহ্‌র নাম নিলেও অন্তরে কেবল তাদের আমি এবং আমিত্ব রয়েছে। বর্তমান যুগে এ পৃথিবীতে সত্যিকার তাকওয়া সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। অতএব এই মুসলমানদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, তাঁকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত এদের সংশোধন সম্ভব নয়। তাই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় আরো সমৃদ্ধ হওয়া উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই পথপ্রদর্শককে মানার তৌফিক দিয়েছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি (আ.) সাহাবীদের পদমর্যাদা সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের নসীহত করেছেন। সাহাবীদের জীবনাদর্শ কেমন ছিল তা আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং বলেছেন, তোমাদের উচিত তাদেরকে আদর্শ জ্ঞান করা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করা। অতএব এটিই সেই মাধ্যম, যেটিকে আমরা যদি নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখি এবং তাঁর কথাকে বুঝার এবং এর ওপর আমল করার চেষ্টা করি তাহলে সত্যিকার মুসলমানেও পরিণত হতে পারি।

তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন:

"প্রকৃত কথা হলো, মানুষ নিজের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সকাশে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই অর্জন করতে পারে না, বরং নিজের ক্ষতি করে। কিন্তু সকল কামনা-বাসনা এবং স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সে যদি রিক্ত হস্তে আর স্বচ্ছ হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সকাশে উপস্থিত হয় তাহলে খোদা তাকে দান করেন এবং তাকে সাহায্য

করেন। কিন্তু শর্ত হলো, মানুষ যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তাঁর পথে লাঞ্ছনা ও মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন:

"দেখ ইহজগত ক্ষণভঙ্গুর এবং নশ্বর, কিন্তু এর স্বাদও তারাই পায় যারা খোদার খাতিরে একে পরিত্যাগ করে। একারণেই যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়," (সাহাবীদের জীবন-চরিতে আমরা দেখেছি, যখন খোদার খাতিরে জাগতিকতা পরিত্যাগ করেছেন তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদরেকে অঢেল দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। এত অঢেল দানে ভূষিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের চিন্তা হলো নিজেদের পরকাল। অর্থাৎ তারা যেন আপাদমস্তক খোদারই হয়ে গিয়েছিলেন।) তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়, খোদা তা'লা ইহজগতে তাকে গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। এটি সেই গ্রহণীয়তা যার জন্য জগৎপূজারীরা হাজারো চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যেন কোনভাবে কোন উপাধি লাভ হয় বা কোন সম্মানজনক জায়গা অথবা দরবারে কোন আসন লাভ হয় এবং চেয়ারে আসনপ্রাপ্তদের মাঝে যেন নাম লেখাতে পারে। মোটকথা, সমস্ত জাগতিক সম্মান তাকেই দেয়া হয় আর সকল হৃদয়ে তারই মাহাত্ম্য এবং গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা হয়, যে আল্লাহ্‌র খাতিরে সবকিছু পরিত্যাগ করার এবং হারানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর শুধু প্রস্তুতই হয় না বরং পরিত্যাগ করে। এক কথায় খোদার খাতিরে যারা হারায় তাদেরকে সবকিছু দেয়া হয়। আর তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ইহধাম ত্যাগ করে না যতক্ষণ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি না লাভ করে, যা তারা খোদা তা'লার পথে বিসর্জন দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কারো কাছে ঋণী থাকেন না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এসব বিষয় মান্যকারী আর এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবনকারী মানুষ খুব কমই রয়েছে।"** **(মলফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্য থেকে মুদ্রিত সংস্করণ)**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন আমরা যেন তাঁর কথাগুলো মেনে খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রকৃত অনুসারী হই এবং শিক্ষা মান্যকারী হই।

নামাযের পর আমি একজনের হাযের জানাযা পড়াব যা শ্রদ্ধেয়া আমাতুল মজীদ আহমদ সাহেবার জানাযা, যিনি যুক্তরাজ্যের নায়েব আমীর এবং কেন্দ্রীয় জায়েদাদ বিভাগের প্রধান চৌধুরী নাসের আহমদ সাহেবের স্ত্রী। গত ৯ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের প্রপৌত্রী ছিলেন। বিয়ের পর ১৯৭৮ সাল থেকে মসজিদ ফযলের পাশেই বসবাস করছিলেন। রীতিমত নামায এবং রোযায় অভ্যস্ত ছিলেন, নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারীনি, অত্যন্ত সহানুভূতিশীলা, মিশুক, অতিথিপরায়ণ, পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। সবার সুখদুঃখ ও বেদনায় সমব্যথী ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক ছিল। আর নিজ সন্তানদের সবসময় এই সম্পর্ককে অটুট রাখার উপদেশ দিতেন। রীতিমত নামায পড়ার নসীহত করতেন। সন্তান-সন্ততির উত্তম তরবীয়তের চেষ্টা করেছেন। একইসাথে তার পাড়ার শিশুদের কুরআন পড়ানোরও সৌভাগ্য পেয়েছেন। লাজনা

ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের খিদমতে খালক এবং যিয়াফত বিভাগের দায়িত্ব ছাড়াও যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় আতিথেয়তা বিভাগের নাযেমা হিসেবে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি তার স্বামী চৌধুরী নাসের আহমদ সাহেব এবং চারজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। যুক্তরাজ্য লাজনার বর্তমান সদর সাহেবা এবং সাবেক সদর শামায়েলা নাগী সাহেবা, উভয়ে লিখেছেন, সবার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী এক নারী ছিলেন তিনি। আর এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা তার সাথে সাক্ষাৎকারী প্রত্যেকেই অনুভব করতো। দীর্ঘকাল জলসায় অতিথিসেবা বিভাগের নাযেমা বা ব্যবস্থাপিকার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সাথে পালন করেছেন। এছাড়া সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবেও খিদমত করার তৌফিক পেয়েছেন আর একান্ত বিনয়ের সাথে এই কাজ সমাধা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার পুণ্য কাজগুলো তার কন্যাদের মাঝেও চলমান রাখুন। যেহেতু এটি হাযের জানাযা তাই আমি যেমনটি বলেছি নামাযের পর, আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২-৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, খণ্ডঃ ২৫, সংখ্যাঃ ৫, পৃঃ ৫-৮)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)